بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ২৮ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে যুগ-ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-কে 'হাকাম ও আদাল' তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার কথা, বিভিন্ন দল ও মতের ভুল ব্যাখ্যা এবং তুচ্ছবিষয়াদীর ক্ষেত্রে মতানৈক্য দূর করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার কথা এবং মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার কথা। অতএব আজ আমরা দেখি! মুসলমানদের প্রত্যেক দল হতে সেসব মানুষ, যারা গভীরভাবে অভিনিবেশ করেছে, ইসলামের বিভিন্ন দলের মতভেদের ক্ষতিকর দিকগুলো অনুভব করেছে, তারা জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং দোয়ার সাহায্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে যোগদান করেছে এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এমন ব্যক্তিরা জামা'তে যোগদান করছে। কাজেই, আহমদীয়া জামা'ত কোন ফির্কা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অথবা মতবিরোধ এবং তফসীর ও ব্যাখ্যায় ভর করে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত নয়, বরং এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে শেষ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। যে জামা'ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে শিয়া-সুন্নী অথবা অন্য কোন মত ও পথের লোকদের মাঝে বিদ্যমান মতভেদগুলো দূর করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হবে। মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে আমাদেরকে এক উম্মতে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ কাজের জন্যই তিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এলহাম করে বলেছেন, **"পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ কর– একমাত্র মতাদর্শে "**। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্কন্ধে যে কাজ ন্যস্ত করেছেন, তাঁর (তিরোধানের) পর খিলাফতের সাথে যুক্ত থেকে ও বয়আত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতেরও এই একই কাজ। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিগত একশ' ত্রিশ বছর ধরে এ কাজই করে যাচ্ছি। অথবা যখন থেকে খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে অর্থাৎ একশ' বারো বছর যাবৎ করে যাচ্ছি। এর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কাজই করেছেন। পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত, সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে যুগ-ইমাম এবং ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারীর গভীর তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে শুধুমাত্র মুসলমানদেরই অবহিত করছে না বরং অমুসলমানদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অবহিত করে তাদেরকেও ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতএব, মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যেই মসীহ্ মওউদ এবং ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারীর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতা মামলা-মোকদ্দমা, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং গালি-গালাজের বিপরীতে আমাদের পক্ষ হতে

প্রত্যেককে শান্তি, নিরাপত্তা এবং দোয়ার বার্তাই দেওয়া হয়। সত্যের প্রচার এবং সত্য বলা থেকে আমরা কোনক্রমেই বিরত হব না আর এ লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন ত্যাগও স্বীকার করছি। আমাদের পক্ষ থেকে পূর্বেও ঝগড়া-বিবাদ এবং গালি-গালাজ করা হয় নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। ঐশী জামা'তের বিরোধিতা হয়ে থাকে আর তাদেরকে যুলুম-নির্যাতনও ভোগ করতে হয়, কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সফলতা দান করেন। যেমনটি আমি বলেছি, আমরা দোয়াও করি আর যুগ ইমামের বাণীকে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি দেশের মানুষের কাছে প্রচার করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, কিন্তু সাধারণ মুসলমান, আন্তরিক শ্রেণী, সত্য সন্ধানী এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করার বাসনাপোষণকারী জ্ঞানী ও বিবেকবানদের আমি বলছি, এ বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা বা প্রণিধান করুন। প্রাথমিক কয়েক দশক ছাড়া, শুরু থেকেই শত শত বছর যাবৎ, মুসলমানরা মতপার্থক্যে জড়িয়ে নিজেদের একতা ও ঐক্যের ভিতকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করে আসছে। আজকাল আমরা মুহাররম মাস অতিবাহিত করছি, যা ইসলামী বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস। ইংরেজী বছরের শুরুতে আমরা একে অপরকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, ইসলামী বছরের শুরুতে বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে খুনোখুনি হয়ে থাকে। সেই ধর্ম, যা শান্তি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সবচেয়ে মহান শিক্ষা দিয়ে থাকে, কেন এর মান্যকারীরা নিজেদের বছরের সূচনা ফিতনা ও নৈরাজ্য এবং খুনোখুনির মাধ্যমে করে, আমাদের তা ভেবে দেখা উচিত। আমাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত যে, কীভাবে আমরা মুসলমানদের উম্মতে ওয়াহেদা বা ঐক্যবদ্ধ উম্মত বানিয়ে এসব নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে পারি। আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যদি ইসলামের প্রাথমিক উন্নতির পর এক বক্র যুগের সংবাদ দিয়ে থাকেন, তাহলে পাশাপাশি এই শুভসংবাদও দিয়েছিলেন যে, নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই বিষয়, যার কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, সেই একই বিষয় শেষ যুগে নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলমানদের উম্মতে ওয়াহেদা তথা এক উম্মত বানানোর মাধ্যম হয়ে উঠবে, মুসলমানদের উন্নতি এবং একতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে। অতএব যখন যুগের অবস্থা ঘোষণা দিচ্ছে যে, এটিই সেই যুগ। আর পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব লক্ষণ জানা যায় তা পূর্ণ হচ্ছে বা হয়ে গেছে, তাহলে কেন আমরা সেই হাকাম ও আদাল তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীর এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের সন্ধান করব না, যিনি শিয়া, সুন্নি এবং বিভিন্ন ফিরকা ও দলের মতানৈক্য নির্মূল করে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন? সেসব অন্ধ নামসর্বস্ব আলেমের অনুসরণ করবেন না যারা নিজেরাও ধ্বংস হচ্ছে আর তাদের সাথে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যাকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। দেখুন, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব লক্ষণের কথা জানা যায় সেগুলো যেহেতু পূর্ণ হয়েছে, তাই আমাদের যাচাই করে দেখা উচিত যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যাকে দাঁড় করানো হয়েছে তিনি কে, তার সন্ধান করা প্রয়োজন। কারো না কারো তো দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। আমরা আহমদীরা বলি, তিনি হলেন আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যার স্কন্ধে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অথবা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করছেন বা করবেন, যিনি ঝগড়া-বিবাদ ও নৈরাজ্যকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। অতএব আমাদের মাঝে যদি

জ্ঞানবুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে আমাদের উচিত আমরা যেন মুহাররম মাসকে কেবল শোক প্রকাশ অথবা নিজেদের বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনের মাস না বানাই, কেবল নিজেদের আবেগঅনুভুতি প্রকাশের মাধ্যম না বানাই, বরং আমরা যেন এটিকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসার মাস বানাই। আমরা যেন সেই প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করি যা ইসলামের শিক্ষা। আমরা যেন সেই পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করি যাকে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হাকাম ও আদাল তথা ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। তবেই আমরা প্রকৃত মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারব। তখনই আমরা জগদ্বাসীকে আমাদের অনুবর্তী করতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে এক আলেমকে বোঝাতে গিয়ে বলেন,

আমার পদমর্যাদা এক মৌলভীর পদমর্যাদা নয়, বরং আমার পদমর্যাদা নবীগণের পদমর্যাদার অনুরূপ। আমাকে এক ঐশী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেনে নাও, তাহলে দেখবে মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া-বিবাদের নিমিষেই অবসান ঘটতে পারে। যিনি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আগমন করেছেন– তিনি পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা করবেন তা-ই সঠিক হবে, আর যে হাদীসকে তিনি সঠিক আখ্যা দিবেন সেটিই সঠিক হাদীস হবে। নতুবা দেখ, শিয়া-সুন্নিদের ঝগড়া কি আজ পর্যন্ত সমাধান হয়েছে? এখন পর্যন্ত তো হয় নি। শিয়ারা যদি তাবার্‌রা করে অর্থাৎ তিন খলীফাকে গালমন্দ করে বা তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলে থাকে তাহলে অপরদিকে কিছু এমন মানুষও আছে যারা হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু সম্পর্কে বলে,

বার্ খিলাফত দিলাশ বাসে মায়েল, লিক বু বকর শুদ দারমিয়ান হায়েল

অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি তার (অর্থাৎ আলীর) হৃদয় ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিল কিন্তু আবু বকর এতে বাধ সাধলেন। অর্থাৎ তিনি এর আকাঙ্ক্ষী বা অভিলাষী ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু আমি বলছি, এ পন্থা পরিত্যাগ করে আমাকে গ্রহণ না করবে তারা কখনোই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাদের (সত্যে) বিশ্বাস না থাকলেও কমপক্ষে এতটুকু চিন্তা করা উচিত যে, অবশেষে এক দিন মরতে হবে আর মৃত্যুর পর নোংরামি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে একজন ভদ্রলোকের কাছেও গালমন্দ করা অপছন্দনীয়, সেখানে পরম পবিত্র সত্তা খোদার নিকট (তা) কীভাবে ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে? এভাবে একজন মানুষ যখন বাজে কাজ করে বা যুলম করে তখন তার ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ইবাদত বলে গন্য হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, এজন্যই আমি বলে থাকি, আমার কাছে আস এবং আমার কথা শুন যাতে করে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পার। আমি তো পুরো আলখাল্লাই খুলে ফেলতে চাই। সত্যিকার অর্থে তওবা করে মু'মিন হয়ে যাও। তোমরা যে মনগড়া ও ভ্রান্তবিশ্বাসের আলখেল্লা পরিধান করে রেখেছ তা খুলে ফেল আর সত্যিকার অর্থে তওবা কর, তাহলেই মু'মিন হতে পারবে। তোমরা যে ইমামের জন্য অপেক্ষমান, আমি বলছি সেই ইমাম আমি-ই আর এর প্রমাণ তোমরা আমার কাছ থেকে নাও।

অতএব এটি হলো সেই প্রকৃত সত্য যার মাধ্যমে ধর্মের সঠিক বুৎপত্তি অর্জিত হওয়া সম্ভব। পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদ নিরসন ও আমিত্ব দূর করার পর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হোন, তাঁর সমীপে দোয়া করুন, সত্যিকার অর্থে তওবা করুন। আর এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন হৃদয়কে সকল প্রকার সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হবেন আর এরপরই আল্লাহ্ তা'লা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন। খুলাফায়ে

রাশেদীন (রা.)-এর সম্মান, মর্যাদা ও পুণ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

আমি এটি জানি, কোন ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাইন-এর রঙ্গে রঙ্গিন না হবে। এ জগতের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং তাঁরা তো তাদের জীবন আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার মু'মিন ও মুসলমান হতে হলে এই চার খলীফাকেই নিজেদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে অবলম্বন করতে হবে। এমনটি হলে ফির্কা বা মতবাদের আর কোন বিতর্কের অবকাস থাকে না। কাজেই যখন আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস হলো উক্ত সবাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ তখন আহমদীয়া জামা'তই কি এমন একটি জামা'ত বিবেচিত হয় না যে জামা'ত তাদের মাঝে বিদ্যমান সমস্ত বিভেদ দূর করে ঐক্য স্থাপনকারী জামাত? খুলাফায়ে রাশেদীনের ৪ খলীফারই এক মাকাম ও মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকের পদমর্যাদার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকের এই মর্যাদা অনুধাবন ও চেনার লক্ষ্যে আমি কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যাতে নবগতরা এবং যুবকরাও বুঝতে পারে যে, আমাদের মতাদর্শ কী, আমার কী বিশ্বাস করি এবং আমাদের ধর্মমত কী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই যুগেও অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে একদম সূচনালগ্নেই মুসায়লামা অন্যায়ভাবে লোকজনকে একত্রিত করে রেখেছিল। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং ভ্রান্ত বিষয়কে বৈধতা দিয়ে কেবল মানুষকে একত্রিত করার জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়। তিনি (আ.) বলেন, এমন যুগে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত হন। তাই মানুষ অনুমান করতে পারবে যে, কিরূপ কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকবে। তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-যদি দৃঢ়চিত্ত না হতেন, এর ঈমানে যদি মহানবী (সা.)-এর ঈমানী রং না থাকত তাহলে খুবই কঠিন হতো এবং তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সিদ্দীক (রা.) নবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ (তাঁর ওপর) মহানবী (সা.)-এর ছায়া পড়েছিল। তাঁর ওপর মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল আর তার হৃদয় দৃঢ়-বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর পর খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবনের ওপরই ইসলামের জীবন নির্ভর করছিল। এটি এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজনই নেই। সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে পড়ে দেখ আর এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে কাজ করেছেন তা অনুমান করে দেখ। আমি সত্যি বলছি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি আবু বকরের সত্তা না থাকত তাহলে ইসলামও থাকত না। অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শরীয়তের সুরক্ষার জন্য তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কেই দাঁড় করিয়েছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সুসম্পর্কের কারণে তিনিই ইসলামকে জীবন দান করেন আর শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ ও বিফল করেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বীয় ঈমানী শক্তিবলে তিনি সমস্ত বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি

প্রতিষ্ঠা করব– এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে আর স্বর্গ-মর্ত্য কার্যত এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এ হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা অর্থাৎ তাঁর মাঝে সততা ও উৎকর্ষ এরূপ মানের হওয়া চাই।

হযরত উমর (রা.)-এর গুণাবলী ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, সাহাবীদের মাঝে হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা কত মহান তা জানো কি? কখনো কখনো তাঁর (রা.) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান উমর (রা.)-এর ছায়া দেখে পালিয়ে যায়। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আমার পর যদি কেউ নবী হতো তবে সে হতো উমর। তৃতীয় এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বের বিভিন্ন উম্মতে অনেকে মুহাদ্দেস ছিলেন। এই উম্মতের কেউ যদি মুহাদ্দেস থাকে তাহলে তিনি হলেন উমর।

পুনরায় একস্থানে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান (রা.)- এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক ও হযরত উসমান (রা.) পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন। তাঁরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ পুরস্কারে তাঁদেরকে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। তাঁদের প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী সাক্ষ্য দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীষ্মের সকল ভর দুপুরের দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র ঠান্ডার তাঁরা তোয়াক্কা করেন নি বরং সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবকের প্রেমাসক্তির ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি বরং বিশ্ব প্রভু প্রতিপালক খোদার ভালোবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কর্মে সৌরভ ও কাজে রয়েছে সুবাস । এসবই তাঁদের সুমহান মর্যাদার বাগান এবং পুণ্যের বাগিচার জানান দেয় আর সেগুলোর প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভীত প্রবল বাতাসের মাধ্যমে তাঁদের গোপন (গুণাবলীর) সংবাদ দেয় এবং তাঁদের জ্যোতিসমূহ আপন পূর্ণ প্রভায় আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

আমি যেসব উদ্ধৃতি পাঠ করছি সেগুলোর বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের, আর এটি আরবী পুস্তক। আরবী অনুবাদকরা এখন তাৎক্ষণিকভাবে হয়তবা সেই মানের অনুবাদ করতে পারবে না, যখন পুনঃপ্রচার হবে তখন মূল পুস্তক থেকে উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে অনুবাদ করবেন।

হযরত আলীর গুণাবলী এবং তার পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তিনি (রা.) তাকওয়াশীল, পবিত্রচেতা এবং রহমান খোদার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জাতির মনোনীত-বরেণ্য ও সমসাময়িক যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীরপুরুষ, দানশীল ও পবিত্রচেতা ছিলেন। তিনি এমন অনন্য সাহসী যোদ্ধা ছিলেন যে, শত্রুদের গোটা সেনাদলও যদি তাঁর মুখোমুখি হতো তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি সারাটা জীবন অসচ্ছলতার ভেতর কাটিয়েছেন। মানবের জন্য নির্ধারিত ধার্মিকতার চরমমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়

সুপুরুষ। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্বের সাক্ষর রেখেছে। তির ও তরবারি পরিচালনায় তিনি বিস্ময়কর ঘটনাবলী তার মাধ্যমে ঘটতো। পাশাপাশি তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে মনের মরিচা দূর করত আর প্রমাণের জ্যোতিতে তার চেহারা উদ্ভাসিত হতো। বিভিন্ন আঙ্গিকে কথা বলতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এসব বিষয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তার কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সকল গুণে এবং বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন। যে তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে।

এরপর হযরত আলীর পদমর্যাদা এবং খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত আলী যে সত্যান্বেষীদের ভরসাস্থল, দানশীলদের জন্য অনন্য আদর্শ, মানুষের জন্য খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ছিলেন আর একই সাথে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মানব এবং ভূমিকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার এক জ্যোতি ছিলেন– এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার খিলাফতকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ ছিল না বরং নৈরাজ্য এবং অন্যায় ও অত্যাচারের ঝঞ্জাবায়ুতে জর্জরিত যুগ ছিল। মানুষ তাঁর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের খিলাফত নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। তারা হতচকিত ব্যক্তির ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে তাদের উভয়ের পথ পানে চেয়ে থাকত। অনেকেই তাদের দুজনকে ইসলামের আকাশের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং উভয়কে সমমর্যাদার মনে করত, কিন্তু সত্যি কথা হলো, সত্য ছিল আলী মুর্তজার পক্ষে। তাঁর যুগে তাঁর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেছে সে নির্ঘাত বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছে।

এরপর ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের হেফাজত ও এর আমানত রক্ষায় সুবিচার করার ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফারই উন্নত মর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এ বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর, হযরত উমর ফারুক, হযরত যুন্-নূরাইন তথা হযরত উসমান এবং হযরত আলী মুরতজা (রা.)– এদের সবাই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। আবু বকর (রা.) যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম এবং একইভাবে হযরত উমর ফারুক ও হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে পবিত্র কুরআনের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযেলকৃত বলা আমাদের জন্য দুষ্কর হয়ে যেতো।

খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন,

খোদার কসম! তারা এমন লোক যারা সৃষ্টির সেরা মহানবী (সা.)-এর সাহায্যকল্পে মৃত্যু বা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন অবিচল এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে তারা স্বীয় পিতা ও পুত্রদের ত্যাগ করেছেন এবং তাদেরকে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। নিজ প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে তাদের শিরোচ্ছেদ করেছেন। আর খোদার পথে নিজেদের মূল্যবান সম্পদ ও প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন করেছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সৎকাজের স্বল্পতার জন্য কাঁদতেন এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিলেন। তাদের কোন অহংকার ছিল না যে, আমরা কোন পুণ্যকাজ করেছি। তাদের চোখ তৃপ্তিকর ঘুমের স্বাদ নেয়নি, অর্থাৎ তারা কখনো পর্যাপ্ত মাত্রায় ঘুমান নি, কেবল বিশ্রামের খাতিরে দেহের জন্য আবশ্যকীয় ন্যূনতম ঘুমটুকু ছাড়া। তারা নিয়ামতরাজির প্রতি আশক্ত ছিলেন না। তাহলে

তোমরা কীভাবে ভাবতে পার যে, তারা অন্যায় করতেন, সম্পদ আত্মসাৎ করতেন, ন্যায়বিচার করতেন না এবং জুলুম-নির্যাতন করতেন? আর এটি প্রমাণিত যে, তারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে ঝুঁকে থাকতেন এবং ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌তে বিলীন) ব্যক্তি ছিলেন।

অতএব এটি হলো সেই অন্তদৃষ্টি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (ইসলামের) উক্ত চার খলীফার মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে আমাদেরকে দান করেছেন। এটিই সেই মর্যাদা যা প্রত্যেক মুসলমান উক্ত বুযুর্গদেরকে প্রদান করলে পরেই সত্যিকার মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পারস্পরিক মতবৈষম্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতের অংশ হতে পারবে। নতুবা আমাদের মতপার্থক্য ইসলামের কোন উপকারে না আসলেও শত্রুরা অবশ্যই এর সুযোগ নিবে এবং তারা সুযোগ নিচ্ছেও বটে; বর্তমানে আমরা এটিই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এ যুগে ইসলামের কোন সেবা তখনই হতে পারে এবং ইসলামের সুরক্ষার করার বাসনা তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন আল্লাহ্‌র এই সিংহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে; যাকে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা এ কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি এখন আমরা মুহর্‌রম মাস অতিক্রম করছি। কাল বা পরশু দশই মুহর্‌রম আসতে যাচ্ছে যাতে হযরত হোসেন-এর শাহাদাত দিবস উপলক্ষে শিয়ারা তাদের ভাবাবেগ প্রকাশ করে থাকে। হযরত হোসেনকে যেভাবে শহীদ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চরম পাশবিক এক আচরণ ছিল। শিয়ারা এ বিষয়ে যেভাবে আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ করে থাকে কিংবা মোটের ওপর হযরত হোসেন (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে তাদের যে আবেগ রয়েছে তার ভিত্তিতে বা তার নিরিখে আমাদের সম্পর্কে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মনে করা হয় , হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা তাঁর জামা'ত নবী পরিবারের মর্যাদা চিনতে পারেন নি বা বুঝে নি। আহমদীয়া জামা'ত সর্বদা এই ভুল ধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা করে আসছে।

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলেছেন তা আমি এইমাত্র কতিপয় উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি যা দ্বারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আলী (রা.)-এর মাকাম ও মর্যাদা কেমন ছিল তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু একইসাথে আমরা এ বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, বাকি তিন খলীফাও সত্যের ওপর ছিলেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। যাহোক, এখন আমি এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী এবং উক্তির আলোকে কিছুটা বর্ণনা করব যে, তাঁর (আ.) দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পরিবারের মর্যাদা কীরূপ ছিল আর তিনি (আ.) এ প্রসঙ্গে জামা'তের উদ্দেশ্যে কী নসীহত প্রদান করেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক **'সিররুল খিলাফাহ্'**-তে হযরত আলী (রা.) এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবার সম্পর্কে লিখেছেন। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

নিরুপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি সর্বদা প্রেরণা যোগাতেন এবং স্বল্পেতুষ্ট ও অভাবীদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণকারীদের মাঝে অগ্রগামী, অর্থাৎ তিনি পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করেছিলেন, এবং এতে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, আমি জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখেছি; (অর্থাৎ হযরত আলীর

সাথে জাগ্রত অবস্থায় দিব্যদর্শনের সাক্ষাৎ হয়েছে, ঘুমের মধ্যে নয়;) আর সেই অবস্থাতেই তিনি (অর্থাৎ হযরত আলী) অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র গ্রন্থের তফসীর আমাকে প্রদান করেন এবং বলেন, এটি আমার রচিত তফসীর, যা এখন আপনাকে দেয়া হচ্ছে; এই উপহার আপনার জন্য কল্যাণময় হোক! একথা শুনে আমি আমার হাত বাড়িয়ে সেই তফসীরটি গ্রহণ করি এবং মহা-ক্ষমতার অধিকারী, পরম দানশীল আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমি তাকে (অর্থাৎ হযরত আলীকে) গঠনগড়নে ভারসাম্যপূর্ণ, দৃঢ় ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত সদাশয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও আলোকিত ব্যক্তিরূপে দেখেছি। আমি হলফ করে বলছি, তিনি আমার সাথে পরম ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আর আমার হৃদয়ে এই কথা সঞ্চার করা হয়েছে যে, তিনি আমার সম্পর্কে ও আমার বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত আছেন। বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের দিক থেকে শিয়াদের সাথে আমি যে ভিন্নমত পোষণ করি– তিনি সেটাও জানেন; কিন্তু তিনি কোন অসন্তুষ্টি বা অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেন নি, কিংবা আমাকে এড়িয়েও যান নি। বরং তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একান্ত প্রিয়জনের মতো আমার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রকৃত স্বচ্ছ-হৃদয় ব্যক্তিদের মতো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আর তার সাথে হোসেন, বরং হাসান-হোসেন উভয়ে এবং রসূলদের নেতা খাতামান্নাবীঈন (সা.)-ও ছিলেন। অধিকন্তু তাদের সাথে অত্যন্ত সুশ্রী, পুণ্যবতী, সম্ভ্রান্ত, অতিশয় কল্যাণমণ্ডিত ও পবিত্র, শ্রদ্ধাস্পদ, মর্যাদাসম্পন্ন, আপাদমস্তক জ্যোতির্মণ্ডিত এক যুবতী নারীও ছিলেন, যাকে আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখতে পাই, কিন্তু তিনি তা গোপন করে রেখেছিলেন। আমার অন্তরে তাঁর এ পরিচিতি তুলে ধরা হয় যে তিনি হলেন হযরত ফাতেমাতুয্-যাহরা। তিনি আমার কাছে আসেন, আর আমি তখন শুয়ে ছিলাম। তিনি আমার শিয়রে বসেন এবং আমার মাথা নিজের কোলের ওপর রাখেন আর পরম মমতা প্রদর্শন করেন। আমি দেখলাম যে, তিনি আমার কোন দুঃখের কারণে বিমর্ষ ও বিষণ্ন হয়ে আছেন; আর সন্তানদের কষ্টের সময় মায়েদের ন্যায় স্নেহ, মমতা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

এসম্পর্কে নোংরা মন-মানসিকতার মৌলভীরা আপত্তি করে থাকে যে, তিনি (আ.) লিখেছেন হযরত ফাতেমা (রা.) আমার মাথা নিজের উরুতে রেখেছেন। এটা তো সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার যে বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে– তার বর্ণনা হচ্ছে। কিন্তু এসব নোংরা মনমানসিকতার লোকদের কে-কী বলবে! অথচ সাধারণ মুসলমানরা তাদের কথা শুনে মনে করে হযরত ফাতেমাতুয্-যাহরা (রা.) এর অবমাননা করা হয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কীভাবে তিনি কী বলছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি আমার সাথে এক মায়ের ব্যবহার করেছেন।

যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, এরপর আমাকে বলা হয় যে, ধর্মের সম্পর্কের দিক থেকে তাঁর অর্থাৎ হযরত ফাতেমার (রা.) দৃষ্টিতে আমার অবস্থান পুত্রের ন্যায়। আর আমার মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া এ ইঙ্গিত বহন করে যে, আমি আমার জাতি, স্বদেশবাসী এবং শত্রুদের অত্যাচারের সম্মুখীন হব। হযরত ফাতেমা এ কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন যে, আমার পুত্রকে এসব অত্যাচার সইতে হবে। এরপর হাসান (রা.) ও হোসেন (রা.) উভয়ে আমার কাছে আসেন এবং আমার প্রতি সহোদরের মতো

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন এবং সমব্যথীদের ন্যায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই কাশফ জাগ্রত কাশফগুলোর একটি ছিল। এরপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হোসেন (রা.)-এর সাথে আমার এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে; আর এ সাদৃশ্যের গূঢ়তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু ছাড়া কেউ জানে না। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর দুই পুত্রকে ভালোবাসি আর যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমিও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী নই এবং এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ আমার কাছে যা প্রকাশিত করেছেন আমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব আর আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত নই।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমি এই কাসীদা, যা হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সম্পর্কে লিখেছি বা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, এটি মানবীয় কাজ নয়, এটি তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে। সে নোংরা প্রকৃতির মানুষ, যে সিদ্ধপুরুষ এবং পুণ্যবানদের বিরুদ্ধে অপলাপ করে। আমার বিশ্বাস হলো, কোন ব্যক্তি হোসেন (রা.) বা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো পুণ্যবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অপলাপ করে এক রাতও জীবিত থাকতে পারে না আর 'মান আদা ওয়ালীয়ান লি' সতর্কবাণী তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পাকড়াও করে। অতএব কল্যাণমণ্ডিত ও আশিসমণ্ডিত সেই ব্যক্তি, যে স্বর্গীয় ইচ্ছাকে বুঝে এবং আল্লাহ্ তা'লার কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবে ও প্রণিধান করে।

তিনি (আ.) এখানে যে হাদীসের উদ্বৃতি দিয়েছেন এর অর্থ হলো, যে আমার বন্ধুর প্রতি শত্রুতা রাখে, 'মান আদা লী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব্' অর্থাৎ যে আমার ওলী বা বন্ধুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা দিচ্ছি। কারো প্রতি যখন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর তা যদি ব্যক্তিগত বৈঠকে হয় যেখানে অন্য কেউ থাকে না তখন সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হৃদয়ের চিত্র হয়ে থাকে। এমনিতে এক পবিত্র ব্যক্তির প্রতিটি কথা-ই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আপত্তিকারীদেরও এটি জানা উচিত যে, ঘরে বা পারিবারিক গণ্ডিতে তাঁর (আ.) কীরূপ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। স্বীয় রচনাবলীতে বা বক্তৃতায় অথবা সাধারণ বৈঠকেই কেবল হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বা মহানবী (সা.)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করেননি বরং পারিবারিক বৈঠকে সন্তানদের সাথে বসা অবস্থায়ও নিজ আবেগ অনুভুতির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন,

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি এরূপ ভালোবাসার কারণেই মহানবী (সা.)-এর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। যেমন একবার মুহররম মাসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ বাগানে একটি খাটে শুয়েছিলেন। তিনি (আ.) আমাদের সহোদরা মুবারাকা বেগম সাহেবা সাল্লামাহা এবং আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই মুবারক আহমদ মরহুমকে নিজের কাছে ডেকে বলেন, এসো; আমি তোমাদের মুহাররমের ঘটনা শুনাই। তারপর তিনি (আ.) গভীর বেদনার সাথে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদাতের বৃত্তান্ত শুনান। একদিকে তিনি ঘটনা শুনাচ্ছিলেন আর অন্যদিকে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আর তিনি (আ.) বারবার তাঁর আঙুলের ডগা দিয়ে সেই অশ্রুজল মুছছিলেন। এই হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা শেষ করার পর তিনি

(আ.) অত্যন্ত ব্যকুলচিত্তে বলেন, অপবিত্র ইয়াযিদ আমাদের মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্রের ওপর এই অত্যাচার করিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সেই অত্যাচারীদেরকে স্বল্পতম সময়ের ভিতর শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করেন। তখন তাঁর (আ.) ওপর এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছিল এবং নিজ মনিবের কলিজার টুকরার এমন গভীর বেদনাদায়ক শাহাদাতের কল্পনায় তাঁর হৃদয় ছটফট করছিল। আর এসবই ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে।

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবা এক স্থানে বলেন, (ঘটনাটি তাঁর সাথে ঘটেছে, তিনি নিজে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে,) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাগানে একটি খাটে বিশ্রাম করছিলেন। আমি আর মুবারক তাঁকে (আ.) একটি কচ্ছপ দেখাতে নিয়ে আসি। হুযুর (আ.) সেটি উপেক্ষা করে বলেন, এসো; আমি তোমাদের মুহাররমের ঘটনা শুনাই। তিনি বলেন, তারপর আমরা উভয়েই তাঁর পাশে বসে পড়ি। সেটি মুহাররম মাসের প্রথম দশক ছিল। তিনি (আ.) ইমাম হোসেন-এর শাহাদাতের ঘটনা শুনানো আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মহাসম্মানিত নবী (সা.)-এর দৌহিত্র; মুনাফিকরা অত্যাচারীদের হাতে তাঁকে কারবালার প্রান্তরে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় তাঁকে (রা.) শহীদ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর বলেন, সেই দিন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। চল্লিশ দিনের মধ্যে অত্যাচারী খুনিদেরকে খোদা তা'লার আযাব পাকড়াও করে, কেউ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, আবার কারো ওপর অন্য কোন আযাব পতিত হয় আবার কেউ অন্য কোন শাস্তিতে নিপতিত হয়। আর ইয়াজিদকে তিনি (আ.) ইয়াজিদ পলিদ বা নোংরা ইয়াজিদ বলে সম্বোধন করতেন। বেশ দীর্ঘ ঘটনা তিনি (আ.) শুনিয়েছেন। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন বা ব্যকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আর অশ্রু ঝরছিল এবং তিনি নিজের তর্জনীর মাধ্যমে তা মুছে ফেলার চেষ্টা করছিলেন।

এই অত্যাচারের ঘটনা যারাই শোনে, তাদের গা শিউরে উঠে। শত্রুরা যখন প্রাধান্য বিস্তার করে তখন হযরত ইমাম হোসেন (রা.) নিজের ঘোড়ার মুখ ফুরত অভিমুখী করেন সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শত্রুরা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এক ব্যক্তি তাঁকে (রা.) লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে যা তাঁর চিবুকে বিদ্ধ হয় এবং গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। আক্রমণকারীরা আক্রমণ চালিয়ে যায় এবং তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন, আমি শাহাদাতের পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমার পর আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে তোমরা হত্যা করবে না, যাকে হত্যার কারণে আমাকে হত্যার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। অতপর হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র ওপর আমার বিশ্বাস যে, তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে আমার ওপর কৃপা করবেন আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে এমনভাবে প্রতিশোধ নিবেন যে, তোমরা হতভম্ব হয়ে যাবে। সেই পাষাণরা তাঁর (রা.) সাথে এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কেমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল দেখুন! তারা তাঁকে শহীদ করে আর শহীদ করার পর তাঁবুতে গিয়ে লুটপাট করে এবং মহিলাদের মাথা থেকে চাদর খুলে ফেলে। হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-কে শহীদ করার পর তাঁর (রা.) লাশ সম্বন্ধে তাদের কমাণ্ডার ঘোষণা দেয়, এই লাশের ওপর দিয়ে কে ঘোড়া দৌঁড়াবে। এতে দশজন অশ্বারোহী প্রস্তুত হয়ে যায় আর তারা তাঁর (রা.) লাশকে পদপিষ্ট করে। তাঁর কোমরের হাড়, পাঁজরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়। এক বর্ণনা মতে তাঁর শরীরে ৩৩টি বর্ষার আঘাত এবং ৪৩টি তরবারির আঘাত

লাগে, এছাড়া তিরের আঘাতও ছিল। অতঃপর তাঁর শিরোচ্ছেদ করে গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় আর গভর্ণর মাথাটিকে কুফায় রাস্তায় সংস্থাপন করে। এটি চরম পর্যায়ের অত্যাচার বা নির্যাতন। চরম নোংরাশত্রুও এমনটি করবে না। আমি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন বেদনায় তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। সুতরাং কীভাবে এটি বলা যেতে পারে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, আমরা নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখি না বা সে ভালবাসকে বুঝি না! একদা তিনি (আ.) যখন জানতে পারেন যে, হযরত ইমাম হোসেন সম্পর্কে কেউ একজন অশোভনীয় শব্দ উচ্চারণ করেছে তখন তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জামা'তকে নসীহত করেন। তিনি বলেন, স্মরণ রাখবেন কোন একজনের একটি পোষ্ট কার্ডের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, কতিপয় নির্বোধ ব্যক্তি যারা নিজেদের আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সম্পর্কে এই বাক্য মুখে আনে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি ইয়াযিদের হাতে বয়আত না করার কারণে বিদ্রোহী ছিলেন এবং ইয়াযিদ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলেন, লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন অর্থাৎ মিথ্যাবাদিদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। আমার জামা'তের কোন ধার্মিক ব্যক্তির মুখ থেকে এ জাতীয় নোংরা শব্দ বেরিয়ে থাকবে– আমি তা আশা করি না। পাশাপাশি আমার মনে হয়, যেহেতু অধিকাংশ শিয়া তাদের নিয়মিত যিকর-আযকার, তাবার্‌রা ও অভিসম্পাতে আমাকেও যোগ করেছে তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, কোন বোকা বা নির্বোধ ব্যক্তি অজ্ঞতাপূর্ণ কথার প্রতিউত্তরে অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলে থাকবে, যেমনটি কতিপয় নির্বোধ মুসলমান মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের মন্দ কথার প্রত্যুত্তরে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কটুকথা বলে বসে। যাহোক আমি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার জামা'তকে অবগত করছি যে, আমরা বিশ্বাস রাখি, ইয়াযিদ একজন অপবিত্রচেতা দুনিয়ার কীট ও অত্যাচারী ব্যক্তি ছিল। যে অর্থে কাউকে মু'মিন বলা হয়– তা তার মাঝে ছিল না। মু'মিন হওয়া কোন সহজ কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্বন্ধে বলেছেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا (সূরা হুজুরাত: ১৫) অর্থাৎ মু'মিন তারাই হয়ে থাকে– যাদের কর্ম তাদের ঈমানের সাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান খোদিত হয়, যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর খোদাভীতির সূক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ পথকে খোদার জন্য অবলম্বন করে আর তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হয়ে যায়। এমন সব বিষয় যা চারিত্রিক ব্যাধি অথবা অপকর্ম বা আলস্য অথবা শৈথিল্য এক কথায় প্রত্যেক বিষয় যা প্রতিমার ন্যায় খোদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তারা তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু দুর্ভাগা ইয়াযিদের এই সৌভাগ্য লাভ কোনভাবে সম্ভব ছিল না। দুনিয়ার মোহ তাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হোসেন (রা.) পূত-পবিত্র এবং নিঃসন্দেহে তিনি সেই সকল মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা স্ব-হস্তে পবিত্র করেন এবং নিজের ভালবাসায় পরিপূর্ণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেহেশ্‌তের সর্দারদের একজন। তাঁর প্রতি এক অণু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হবে। আর এই ইমামের খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা আর ধৈর্য এবং দৃঢ়তা এবং জগৎ বিমুখতা আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হেদায়েতের অনুসরণকারী– যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ধ্বংস হয়ে গেছে সেই হৃদয়, যে তাঁর শত্রু, আর সফল হয়েছে সেই হৃদয়, যে কার্যত তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে আর তাঁর ঈমান এবং তাঁর চরিত্র, বীরত্ব, খোদাভীতি, অবিচলতা এবং খোদাপ্রেমের সকল ছাপ

প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণ অনুসরণের সাথে নিজের অন্তরে সেভাবে ধারণ করে যেভাবে একটি পরিষ্কার আয়নার মাঝে সুদর্শন মানুষের অবয়ব দেখা যায়। এরা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে । এদের মূল্য তারাই বুঝেন যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের শনাক্ত করতে পারে না, কারণ তারা পৃথিবী থেকে দূরে। হযরত হোসেন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এটিই কারণ ছিল যে, তাঁকে শনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী কোন্ পবিত্র ও মনোনীত ব্যক্তিকে তাঁর যুগে ভালোবেসেছিল যে, হোসেনকে ভালোবাসবে। বস্তুত হোসেন (রা.)-এর অবমাননা চরম দুর্ভাগ্য ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি হোসেন (রা.) অথবা পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভুক্ত কোন বুযূর্গের অবমাননা করে বা তাদের সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে সে তার নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে, কেননা মহাপরাপক্রমশালী আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির শত্রু হয়ে যান যে তাঁর মনোনীত এবং প্রেমিকের প্রতি শত্রুতা রাখে।

এসব কথা শোনার পরও আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন না। মহানবীর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার যে গভীর জ্ঞান তাঁর (আ.) ছিল, তা অন্য কারো মাঝে ছিল না আর থাকা সম্ভবও নয়। তিনি (আ.) এ কথাই বলেছেন। কিন্তু শিয়ারা যেখানে বাড়বাড়ি করেছে বা সীমালঙ্ঘন করেছে সেখানে তিনি প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট করেছেন আর যেখানে সুন্নীদের ভুল হয়েছে সেখানে তিনি (আ.) তাদেরকেও বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। আর এটিই ন্যায় বিচারকের কাজ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা প্রচার ও প্রচলনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় বড় ফিরকা অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নী আহমদীদেরকে আজেবাজে কথা বলে। আমাদেরকে যুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সেকাজ আমাদের করে যেতে হবে যা আমাদের ওপর ন্যাস্ত এবং যে কাজের জন্য আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছি; অর্থাৎ পৃথিবীময় প্রকৃত ইসলামকে প্রচার করা। ইমাম হোসেন প্রদর্শিত আদর্শ দৃষ্টিপটে রাখুন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার এক পঙক্তিতে বলেছেন যে,

তারা তোমাদেরকে হোসেন বানায় আর নিজেরা ইয়াযিদ সাজে
এটি কতই না সস্তা ব্যবসা, শত্রুকে তির চালতে দাও

অতএব আমাদের এই কুরবানী আমাদের এই ত্যাগ ইনশাআল্লাহ্ বৃথা যাবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমার সাথে হোসেনের সামঞ্জস্য আছে ঠিকই, তবে এবার পূর্বের মতো পরিণতি হবে না। বরং এবার পরিণতি সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, কারণ আল্লাহ্ তা'লা এবার হোসেনী গুণের অধিকারীদের জন্যই বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন অপরদিকে শত্রুরা ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হবে। সুতরাং আমাদের সবসময় বিশেষ করে এই মাসে বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত, কেননা পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানের শত্রুরা চরমরূপ ধারণ করেছে।এমতাবস্থায় দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনযোগ দিন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন। যত বেশি আমরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে মাথা অবনত করব, ততই দ্রুত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিজয় ও সফলতা দান করবেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। মুসলমান দলগুলো নিজেরাই একে অপরের গলা কাটতে ব্যাস্ত। বিশেষ করে দশই মুহাররাম তারিখে ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ইমাম বারগাহ্ এবং তা'যিয়া মিছিলে বা অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করা হয়, মানুষকে

শহীদ করা হয়, ধর্মের নামে শহীদ করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন এবং কমপক্ষে এ বছর যেন কোন দেশ থেকে এই সংবাদ না আসে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে হত্যা করেছে। মুসলমানরা যেন এই প্রকৃত সত্যকেও দ্রুত অনুধাবন করতে পারে যে, ইসলামের জন্য যে বিজয় আল্লাহ্ তালা নির্ধারণ করেছেন, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই করেছেন এবং তাদের সফলতা এখন যুগ ইমামের হাতে বয়আত করার মাঝেই নিহিত, এই উপলব্ধিও যেন তাদের মাঝে দ্রুত সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বুঝার সৌভাগ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)